ভারতের বিপ্লবে সশস্ত্র সংগ্রামের ভূমিকা

কে এন রামচন্দ্রন

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো সমাপ্ত হয়েছে এই কথাগুলি উচ্চারণ করে : ''আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিস্টরা ঘৃণা বোধ করে। খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে, তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে কেবল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বলপূর্বক উচ্ছেদের মারফত। কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসকশ্রেণীরা কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতদের হারাবার কিছু নেই। জয় করবার জন্য আছে সারা পৃথিবী...।'' পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে নিজস্ব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সূত্রে, মার্কস ও এঙ্গেলসের এই প্রশ্নে কোনরকম দ্বিধা ছিল না যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদের মাধ্যমেই একমাত্র সর্বহারাশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। পুঁজিবাদ তার সর্বোচ্চ পর্যায়, আরও বেশি বর্বর সাম্রাজ্যবাদে উন্নীত হওয়ার সাথে সাথে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের দশকগুলিতে, আরও নারকীয় এবং সর্বনাশা নয়া-উপনিবেশবাদের রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফাটকা পুঁজি এবং বাজার-সর্বস্বতা পুঁজির অমানবিক চরিত্রের নিকৃষ্টতম প্রকাশের মাধ্যমে, মার্কস ও এঙ্গেলস যা ঘোষণা করেছিলেন, তাকে শতগুণ বেশি সপ্রমাণিত করেছে। সুতরাং, প্রথমেই এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া প্রয়োজন, আমাদের পার্টি সিপিআই(এম-এল)-এর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই যে একমাত্র বর্তমান শাসনতন্ত্রের সহিংস উৎসাদনের মাধ্যমেই ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক চালচিত্রের প্রেক্ষাপটে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার অনুচরদের শাসনের অবসান ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল সম্পন্ন হতে পারে।

রুশ বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশলের বিকাশ প্রসঙ্গে লেনিন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, জারতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন আছে কিনা, সে প্রশ্নে নয়া সশস্ত্র সংগ্রাম-সহ বিপ্লবী আন্দোলনকে কীভাবে বিকাশিত করা যায়, সেই প্রশ্নেই তাঁর সঙ্গে সমসাময়িক কমিউনিস্টদের মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। বিষয়টির ব্যাখ্যা করে, লেনিন তাঁর গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কিত নিবন্ধে লিখলেন: ''প্রথম থেকে শুরু করা যাক। সংগ্রামের রূপ সম্পর্কিত কোন্ কোন্ মৌলিক প্রশ্ন মার্কসবাদীদের গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত? প্রথমত, সংগ্রামের কোন এক বিশেষ ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে, সমাজতন্ত্রের সকল প্রাথমিক স্তরে উত্তরণ সম্পর্কে মার্কসবাদ ভিন্নমত পোষণ করে। মার্কসবাদ সংগ্রামের সর্বাধিক বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী এবং সেগুলো কোন 'উদ্ভাবন' নয়। বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বতঃউদ্ভূত যে রূপগুলি মূর্ত হয়, মার্কসবাদ সেগুলিকে কেবলমাত্র সামগ্রিকতা দেয়, সংগঠিত এবং সচেতনভাবে অভিব্যক্ত করে। সমস্ত ধরনের বিমূর্ত ও গোঁড়া পদ্ধতির বিরুদ্ধে, মার্কসবাদ চলমান গণ-সংগ্রামের প্রতি মনোযোগী দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে— যেখানে সংগ্রামের অগ্রগতির সাথে সাথে জনগণের শ্রেণীচেতনা বিকাশ লাভ করে— যেখানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট যত বৃদ্ধি পায়, ততই ধারাবাহিকভাবে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের নতুন নতুন কৌশলের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং, মার্কসবাদ সুনিশ্চিতভাবে সংগ্রামের কোন রূপকেই বাতিল করে না। কোন বিশেষ সময়ে, সম্ভবপর এবং প্রচলিত সংগ্রামী ধারার চৌহদ্দির মধ্যেই মার্কসবাদ কখনো গণ্ডীবদ্ধ থাকে না, সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন অবধারিতভাবে, সংগ্রামের যে নব নব এযাবৎকাল অজ্ঞাত ধারার সূচনা করে, প্রথাগতভাবে সেগুলিকেও স্বীকৃতি দেয়। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, মার্কসবাদ জনগণের কার্যক্রম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিভৃতভাবে জ্ঞানচর্চা করে 'শৃঙ্খলাবাদীরা' সংগ্রামের যে রীতি উদ্ভাবন করেন, সে প্রসঙ্গে শিক্ষা দেবার দাবি করে না। যেমন আমরা জানি, কাউৎস্কি সমাজ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন আসন্ন সঙ্কট এমন কিছু সংগ্রামের ধারা প্রবর্তন করবে, যেগুলি আমরা এখন অনুমান করতে অক্ষম।

দ্বিতীয়ত, সংগ্রামের রূপ সম্পর্কে মার্কসবাদ সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দাবি করে। সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমিকা ব্যতীত এই বিষয়টি বিবেচনা করার অর্থ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রাথমিক জ্ঞানার্জনে ব্যর্থতা। অর্থনৈতিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে, রাজনৈতিক, জাতীয়-সাংস্কৃতিক, জৈবিক এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতার ফারাকের দরুন, সংগ্রামের বিভিন্ন ধারা প্রাধান্য লাভ করে এবং সংগ্রামের প্রধান ধারায় পরিণত হয়। সেই সূত্রে সংগ্রামের অপ্রধান ও আনুষঙ্গিক ধারাগুলিও যথাসময়ে পরিবর্তিত হয়। সংশ্লিষ্ট আন্দোলন যে পর্যন্ত বিকশিত হয়েছে, সেই পরিস্থিতির বিশদ মূল্যায়ন না করে, সংগ্রামের কোনও এক বিশেষ পন্থা অবলম্বন করা হবে কিনা, সে বিষয়ে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলার প্রচেষ্টা নেওয়ার অর্থ, মার্কসবাদী অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুতি।''

লেনিন আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেন, ''একজন মার্কসবাদী নিজে শ্রেণী-সংগ্রামের উপর নির্ভর করে, সামাজিক শান্তির উপর নয়। তীব্র আর্থ-রাজনৈতিক সঙ্কটের কোন কোন পর্যায়ে, শ্রেণী-সংগ্রাম সরাসরি গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়, অর্থাৎ জনগণের দুই পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম। এইরকম পরিস্থিতিতে, একজন মার্কসবাদী গৃহযুদ্ধের পক্ষে দাঁড়াতে দায়বদ্ধ। গৃহযুদ্ধের কোনপ্রকার নিন্দা, মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুরির অসমর্থনযোগ্য।''

তিনি এও বলেছিলেন— ''...শ্রেণী-সংগ্রাম যেসময়ে গৃহযুদ্ধের প্রান্তে উপনীত হয়, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কর্তব্য কেবল তাতে অংশগ্রহণ নয়, সেই গৃহযুদ্ধে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা পালনের কর্তব্যও তারা নিশ্চিত করবে। সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা অবশ্যই তাদের সংগঠনগুলিকে এমনভাবে সত্যসত্যই বিদ্রোহী পক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত ও প্রস্তুত করবে, যাতে শত্রুপক্ষের শক্তি হানি করার একটি সুযোগও নষ্ট না হয়।...''

লেলিনের বক্তব্যে আছে এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকেও এটা স্বপ্রমাণিত যে, জনগণের উপর জোর করে সংগ্রামের রূপ চাপিয়ে দেওয়ার ন্যূনতম প্রবণতা কমিউনিস্টদের মধ্যে থাকা উচিত নয়। গণ-আন্দোলন যখন বাস্তবে অভ্যুত্থানের স্তরে পৌঁছায়, সেই সময়ে গেরিলা যুদ্ধকে সংগ্রামের অপরিহার্য রূপ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন লেনিন। এমনকি শাসকশ্রেণী, নিষ্ঠুর সরকারি কর্মচারী এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে তিনি এই শর্তে গেরিলা কার্যক্রম অনুমোদন করেছিলেন: ১) জনসাধারণের মনোবৃত্তিকে গ্রাহ্য করতে হবে, ২) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনগত পরিস্থিতি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে, এবং ৩) সর্বহারা শ্রেণীর শক্তি যাতে বিক্ষিপ্তভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এখনও পর্যন্ত লেনিনের শিক্ষাকে সঠিক প্রমাণ করে এসেছে। চীনের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে লেনিনের শিক্ষাকে প্রয়োগ করে মাও সেতুং রণকৌশলের বিকাশ সাধন করতে পেরেছিলেন, যা চীন বিপ্লবকে ১৯৪৯ সালে বিজয়ের পথে নি

য়ে যায়। মাও তাঁর রচনা ও বক্তৃতায় বরাবর জোর দিয়ে এসেছেন যে চীনের অভিজ্ঞতাকে অন্যত্র যান্ত্রিকভাবে নকল করা উচিত নয়। তিনি সর্বদা প্রত্যেক দেশের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিপ্লবের গতিপথের বিকাশ সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে এসেছেন এবং লেনিনের ভাষ্য ছিল, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ।

কিন্তু ক্ষতিটা হলো ১৯৬৬ সালে, যখন লিন বিয়াওয়ের 'জনগণের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ দীর্ঘজীবী হোক' প্রকাশিত হলো। ১৯৬৩ সালে গৃহীত 'আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রস্তাবের' বিপরীতে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে বাম হঠকারী লাইনের প্রাধান্য বৃদ্ধি প্রতিফলিত করে ঘোষণা করা হলো : দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধই সকল ক্ষেত্রে বিপ্লবের পথ। লেনিন যেমন বিভাজন করেছিলেন— পূর্বতন সমস্ত ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও নির্ভরশীল দেশগুলিকে অভিন্ন ভাবে প্রাক্-১৯৪৯ চীনের ন্যায় 'আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক' রূপে চিত্রিত করা হলো। সংগ্রামের অদ্বিতীয় রূপ সশস্ত্র সংগ্রাম— এর জন্য তাত্ত্বিক যুক্তি খাড়া করা হলো যে, লেনিনের সময়কালে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ পরিবর্তিত হয়ে ''সাম্রাজ্যবাদের সর্বব্যাপী পতন এবং সর্বহারা বিপ্লবের বিশ্বজনীন বিজয়ের নতুন এক যুগে'' পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে যাকে 'মাও যুগ' হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ''চীনের পথ এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার সকল দেশে প্রযোজ্য''— এই বাম হঠকারী ঝোঁক এভাবেই ১৯৬৯ সালে নবম কংগ্রেসের সময় থেকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে সাময়িক ভাবে হলেও আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সশস্ত্র পন্থাকে সংগ্রামের একমাত্র ধারা হিসাবে প্রচার শুরু হলো, যেটা পরবর্তীকালে সিপিআই(এম-এল)-এর দৌলতে প্রথমে গেরিলা যুদ্ধকে এবং ১৯৭০ সালের কংগ্রেসে 'খতম'কে একমাত্র রূপ হিসাবে চিহ্নিত করার সুবাদে সমরবাদে অধঃপতিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে, যখন সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা আমেরিকার নেতৃত্বে লুণ্ঠনের নয়া-উপনিবেশ রূপ গ্রহণ করলো, সেই সময়ে আন্তর্জাতিক স্তরে ও ভারতে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি ঘটেছিল, সেগুলি বিবেচনা না করে, ১৯৪৭-পরবর্তী পর্যায়ে মুৎসুদ্দি শাসন ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছিল সেগুলি বিশ্লেষণ না করে, ভারতে যান্ত্রিক ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে চীনের পথ অনুসৃত হয়েছিল। ১৯৬৯-১৯৭২ সিপিআই(এম-এল) অনুসৃত এই সংকীর্ণ নীতি শোচনীয় বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয় এবং ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত হয়।

এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও এবং নকশালবাড়ি পরবর্তী দশকগুলিতে, বিশেষত বিগত দুই দশকে নয়া-উদারনীতির পর্বে, দ্রুত পরিবর্তন সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও, সিপিআই(মাওবাদী) মাওয়ের গণ-লাইনকে (mass line) পরিত্যাগ করে মাওয়ের নাম নিয়ে এই আত্মঘাতী পথ অনুসরণ করে চলেছে। তারা না বিবেচনা করছে জনসাধারণের সমাবেশের বর্তমান মান, না বিচার করছে তাদের মানসিকতা, না করছে বিপ্লবের অগ্রবাহিনী প্রায় ২০ কোটি শ্রমিকশ্রেণীর কিংবা বিপ্লবের প্রধান মিত্র ৫০/৬০ কোটি ভূমিহীন, গরীব কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকের সংঘবদ্ধতা ও রাজনীতিকরণের স্তর বিচার, না করছে নয়া-উপনিবেশবাদী লুণ্ঠনের বাস্তব পরিস্থিতিগত বিচার। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটিকে, সিপিআই(মাওবাদী)-রা, বেশি বেশি আধুনিক অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে সমরবাদের স্তরে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। 'লাল সন্ত্রাসের' মাধ্যমে 'শ্বেত সন্ত্রাসকে' প্রতিহত করার নামে তারা তথাকথিত পুলিসের চরদের সরাসরি হত্যার পথ গ্রহণ করেছে, এমনকি সাধারণ নাগরিকদেরও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছে। তারা এই বাস্তবকে গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করছে যে, ভারতের বিপ্লব এমন এক সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে, যখন পূর্বতন সকল সমাজতান্ত্রিক দেশ পুঁজিবাদের পথে অধঃপতিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এমন সাঙ্ঘাতিক ধাক্কা খেয়েছে যে, যা অতিক্রম করার জন্য বর্তমান পরিস্থিতি অনুসারে অসঙ্গত ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে লড়াই এবং সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতার্জনের পর শ্রেণী-সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বানটিও ভেবে দেখা উচিত।

সিপিআই-সিপিআই(এম) জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ বর্জন করেছে। যেখানেই তারা ক্ষমতাসীন সেখানেই তারা শাসকশ্রেণীর নয়া-ঔপনিবেশিক নীতিগুলি কার্যকর করার ভূমিকায় অবনমিত হয়েছে অথবা অন্যান্য রাজ্যে তাদের স্তাবকে পরিণত হয়েছে এবং এইভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছে। অপরদিকে মাওবাদের ধ্বজা তুলে, সিপিআই(মাওবাদী)-র নৈরাজ্যবাদ শেষ পর্যন্ত দেশে জনগণের যে বিপ্লবী আন্দোলন স্ফূরিত হচ্ছে, সে ধরনের সব আন্দোলন এবং জনগণের প্রতিক্রিয়া দমন করার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্রকে সাহায্য করছে। পশ্চিমবঙ্গে তিন দশকের সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন শাসন, তাদের ''সরকারের সাহায্যে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নতি করার' সমাজ-গণতন্ত্রী দাবির স্বরূপ উদঘাটিত করেছে। সিপিআই(মাওবাদী)-র বক্তব্য অনুযায়ী, যদি দান্তেওয়াড়া এবং অন্যত্র ৬০০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণের দাবি মেনে নেওয়াও যায়, তাহলেও এই সমস্ত এলাকায় সাধারণ মানুষের শোচনীয় জীবনযাত্রা প্রমাণ করে যে, এডগার স্নো বর্ণিত ইয়েনান থেকে তা অনেক অনেক দূর। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ এবং নৈরাজ্যবাদ— উভয় পথই বর্জন করা উচিত। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় ও সমাজতন্ত্রের অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য, বর্তমান নয়া-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বিপ্লবের পথ বিকশিত এবং অনুসরণ করা উচিত।

যে সমস্ত সংগঠন ও ব্যক্তি, সিপিআই-সিপিআই(এম)-এর নীতি এবং সিপিআই(মাওবাদী)-র নীতি দুইয়েরই বিরোধিতা করে, এই পর্যন্ত তাদের মধ্যে (কেবলমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে, সেটা উপলব্ধি করা ব্যতীত) অনেকটা মতৈক্য দৃশ্যমান। যদিও তাদের কেউ কেউ সিপিআই-সিপিআই(এম)-এর নীতি বাতিল করলেও, চীনে যারা ক্ষমতা দখল করেছে, সেই পুঁজিবাদীদের এখনও সমর্থন করেন এবং বাস্তবে তারা সংসদ-সর্বস্বতাকে প্রায় আঁকড়ে ধরে, সিপিআই(এম)-এর 'বি' টিম হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। অনেকে মাওবাদীদের নৈরাজ্যবাদী কর্মপন্থার সমালোচক হিসাবে দাবি করলেও, কোন কোন সময়ে, বিপ্লবের পথ সম্পর্কে তাদের তাত্ত্বিক অবস্থান ও মনোভাব কার্যত মাওবাদীদের অনুরূপ। একটাই তফাৎ, তারা তাদের নিজস্ব ব্রান্ডের 'দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ' প্রয়োগ করার কোন পদ্ধতি গড়ে তুলতে পারেন নি। বাস্তবত তারা মাওবাদীদের 'বি' টিমের ভূমিকা পালন করছে। শান্তিপূর্ণ এবং সহিংস সংগ্রাম সংযুক্তির প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য কেবল মুখের কথা। বাস্তবে তারা যে পাঁচমিশালি কর্মসূচি অনুসরণ করে চলেছে, তাতে সর্বক্ষেত্রেই তারা ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছে।

সিপিআই-সিপিআই(এম)-এর সমাজ-গণতন্ত্রী নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করে, মাওবাদীদের নৈরাজ্যবাদী নীতির স্বরূপ উদঘাটন করে এবং বিচ্ছিন্ন পাঁচমিশালি প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, পুনর্গঠিত সিপিআই(এম-এল)— ১৯৪৭-এ ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতবর্ষ মু

ৎসুদ্দি শাসনাধীনে উপনিবেশ থেকে নয়া-উপনিবেশে পরিণত হয়েছে— এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে, সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক-বুর্জোয়া-বৃহৎ ভূস্বামী পরিচালিত ভারতীয় রাষ্ট্রকে পরাভূত করার ডাক দেয়। এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং সকল বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, ২০০৯ সালে সর্বভারতীয় বিশেষ অধিবেশনে সিপিআই(এম-এল), ভারতের বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় বিপ্লবের পথ সম্পর্কিত একটি দলিল হাজির করেছে। একই সঙ্গে, দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের চীনা পথ এবং ১৯৭০ সালের কংগ্রেসে গৃহীত ও সিপিআই(মাওবাদী) ও অন্যান্য গোষ্ঠী কর্তৃক এখনও অনুসৃত ভারত সম্পর্কিত আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক বিশ্লেষণ পার্ট পরিত্যাগ করেছে। আমরা বিপ্লবের যে গতিপথের ভাবনা পেশ করেছি, তা ১৯৫১ সালে অবিভক্ত সিপিআই কর্তৃক গৃহীত, এবং অল্পদিন পরে পরিত্যক্ত, রণনীতি ও রণকৌশল গত কর্মসূচির অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের ধারাবাহিকতা। সিপিআই(এম-এল) প্রস্তাবিত বিপ্লবের পন্থা সমস্ত প্রকার সংসদ-সর্বস্বতা ও সংস্কারবাদ বর্জন করে এবং সংগ্রামের সকল ধারা ব্যবহার করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পথ অনুসরণ করার আহ্বান জানায়। শাসন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শহরগুলিতে ব্যারিকেড গড়ে তোলার মতো দেশব্যাপী সংগ্রামের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত ও রাজনীতি সচেতন করতে হবে। তার সঙ্গে যুক্ত হবে অসংখ্য ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক ও আদিবাসী, দলিত ও অন্যান্য সর্বাপেক্ষা শোষিত শ্রেণী সহ কৃষিশ্রমিকদের সমাবেশ এবং ‘লাঙ্গল যার জমির তার’ নীতির ভিত্তিতে বিপ্লবী কৃষি সংগ্রামের প্রস্তুতি। কৃষিজমি বেদখল ও উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে যে অগণিত গণ-প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে, তা থেকে বোঝা যায় লক্ষ লক্ষ কৃষক ও গ্রামীণ জনসাধারণের সব অংশ কত ধরনের গণ-আন্দোলনে সামিল হতে পারে। শহরের দরিদ্র শ্রেণী, যুব, ছাত্র, নারী আন্দোলন-সহ সকল নিপীড়িত শ্রেণীর আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম এবং বৈপ্লবিক কৃষি আন্দোলন সম্মিলিতভাবে, বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী, সশস্ত্র রূপ-সহ সংগ্রামের সকল ধারা বিকশিক করে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে, গণ-অভ্যুত্থান ও গণ-বিদ্রোহের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।

নয়া-উদারনীতির তীব্রতা বৃদ্ধি এবং পরিণামে বিভিন্ন প্রকারে নয়া-ঔপনিবেশিক দাসত্ব জনসাধারণকে নিঃস্ব করছে এবং সমস্ত দেশকে অদৃষ্টপূর্ব মাত্রায় ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে। এই নীতি সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং জনসাধারণের মধ্যে দ্বন্দ্ব, পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রীয় কৃষিনীতিকে কেন্দ্র করে কৃষক এবং ভূ-স্বামীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, প্রতিক্রিয়ার শক্তি এবং জনগণের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দ্বন্দ্বসমূহের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে। এই দ্বন্দ্বসমূহ, স্বতঃস্ফূর্ত উত্থান-সহ, বিভিন্ন মাত্রায় গণ-প্রতিরোধের জন্ম দিচ্ছে। এই চমৎকার বাস্তব পরিস্থিতিতে যেটা দরকার— শ্রেণী-সংগ্রাম বিকশিত করার স্বার্থে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী বিকল্প হিসাবে দেশব্যাপী যুক্তফ্রন্ট গঠন সহ, মাও-বর্ণিত পিয়ানোবাদক যেমন সব কয়টি আঙুলের সাহায্যে সুন্দর সুর সৃষ্টি করে, তেমনই বাস্তব পরিস্থিতির বিচার করে সংগ্রামের সব ধারা ব্যবহার করার প্রয়োজনে বলশেভিক নীতির ভিত্তিতে বিপ্লবের নেতৃত্বদানকারী শক্তিসমূহের অর্থাৎ পার্টি ও শ্রেণী/গণ-সংঠনগুলির অতিদ্রুত গঠন। শক্তিশালী বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে জনগণের সমস্ত আন্দোলনকে বিকশিত, ঐক্যবদ্ধ এবং নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সিপিআই(এম)-এর সমাজ গণতন্ত্রী ও সিপিআই(মাওবাদী)-দের নৈরাজ্যবাদী নীতি বর্জন করে সকল বিপ্লবী শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হোক।